বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর প্রকাশনা

OCCASIONAL PAPER 1
Legislative Advocacy for the Establishment of Human Rights Commission in Bangladesh

OCCASIONAL PAPER 2
Legislative Advocacy for the Regulation of Election Expenses in Bangladesh

OCCASIONAL PAPER 3
Legislative Advocacy for The Establishment of the Office of Ombudsman in Bangladesh

অকেশনাল পেপার ৪
বাংলাদেশে ন্যয়পাল নিয়োগ

OCCASIONAL PAPER 5
Towards a Labour Code for Bangladesh

OCCASIONAL PAER 6
Towards a Human Rights Commisssion for Bangladesh

OCCASIONAL PAER 7
Ligislative Advocacy for the Ruglation of Election Expenses

প্রচারপত্র ১
আমাদের তথ্য জানার অধিকার

প্রচারপত্র ২
আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ

Tabassum Dana
Hospital Waste Management in Dhaka
An Exploration in search of policy: Guidelines and Rules

বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রেশনঃ প্রয়োজনীয় তথ্য

BLAST Annual Report 1995, 1996, 1998

ব্লাস্ট বুলেটিন

Shahnaz Huda
Registration of Marriage and Divorce: A Study on Law and Practice
Dhaka, 1999; Soft Cover, pp.vii+90; Price 40 taka

Naim Ahmed
Public Interest Letigation: Constitutional Issues and Remedies
Dhaka, 1999; Hard Cover, pp. ix+190; Price 150 taka

শাহনাজ হুদা
বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইনঃ সার্বিক পর্যালোচনা
ঢাকা ১৯৯৯; সফট কভার, পৃষ্ঠা iv+৫৬, মূল্য ৫০ টাকা

বাংলাদেশের জন্য লেবার কোডঃ প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন
ঢাকা ১৯৯৯; সফট কভার, পৃষ্ঠা ii+৯৬, মূল্য ৫০ টাকা

Shahdeen Malik (Ed)
LACUNAE IN LABOUR LAWS
Towards Timely Disposal of Labour Cases
Dhaka, 1999; Soft Cover, pp vii+97; Price 70 taka

আলতাফ পারভেজ
কারাজীবন কারাব্যবস্থা কারাবিদ্রোহ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনঃ আবেদন

সূচীপত্র

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন	১
আমাদের আহ্বান	৫
বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্থাপনকল্পে আনীত বিল, ১৯৯৯	৬
চলতিপত্র	১৫
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত উল্লেখিত আপত্তিঃ প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা	১৭
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও রিপোর্ট	১৯

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন

প্রেক্ষাপট

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের লক্ষে জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার কমিশন গঠন একটি বহুল প্রচলিত ধারনা।

বাংলাদেশের মানবাধিকার লংঘনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পর্যায়ে একটি কার্যকর ও নিরপেক্ষ মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিতেও মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তার বিধানের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার লক্ষে "ইন্সটিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ" (IDHRB) প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৯৬ সালে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে হাত দেয়। এই প্রকল্পের অধীনে জাতিসংঘ নির্ধারিত মানদন্ডের আলোকে (প্যারিস প্রিন্সিপাল নামে পরিচিত) ভারত, নেপাল এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার কমিশনের কাঠামো, লক্ষ্য, দায়িত্ব ইত্যাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে মানবাধিকার কমিশন আইনের খসড়া প্রনয়ণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ এর ১০ই ডিসেম্বর সার্বজনীন মানবাধিকার দিবসে জনসমাজের এক সভায় আইনমন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন খসরু আনুষ্ঠানিক ভাবে মানবাধিকার কমিশনের আইনগত কাঠামোর একটি খসড়া পেশ করেন।

এর পরবর্তী দুবছর উল্লেখিত খসড়াটি বিভিন্ন ভাবে সংশোধিত হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের সুপারিশ যুক্ত করে খসড়াটি পুনলিখিত হয়। বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও খসড়াটির ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

ব্লাস্টের উদ্যোগ

মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার লক্ষে বাংলাদেশ লিগাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ১৯৯৭ সাল থেকে একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম হাতে নেয় এবং একটি কার্যকর, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মানবাধিকার কমিশন গঠনের জন্য গনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা এবং সভা, সেমিনার ও বৈঠক আয়োজন করে। পাশাপাশি একটি "Charter of Demands" এবং একটি খসড়া বিল তৈরী করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, ব্লাস্ট কর্তৃক "Legislative Advocacy for the Establishment of the Human Rights Commission in Bangladesh"

এবং "Towards a Human Rights Commission for Bangladesh"-শিরোনামে দুটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় যা জনসমাজে ব্যাপক ভাবে গৃহীত ও সমাদৃত হয়।

১৯৯৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ব্লাস্ট উল্লেখিত "Charter of Demands" নিয়ে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন খসরু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি নইমউদ্দিন আহমেদ। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান শাহজাহান, সুলতানা কামাল এবং মোঃ জাহাঙ্গীর। উক্ত ওয়ার্কশপে আলোচকবৃন্দ অবিলম্বে জাতীয় পর্যায়ে একটি মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরত্ব আরোপ করেন।

উল্লেখ্য যে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ইন্টারন্যাশনাল ল এসোসিয়েশন এর কমিশন অন সাসটেনেবল ডেভেলাপমেন্ট এর উদ্যোগে ঢাকায় একটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের স্থানীয় আয়োজকদের মধ্যে ব্লাস্ট ছিল অন্যতম। এই সম্মেলনে ভারত, দক্ষিন আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা সহ বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় আইন ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় আইনমন্ত্রী জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের সাথে মত বিনিময় করেন এবং সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে ১৯৯৭ এর ৩০ নভেম্বর দেশের শীর্ষস্থানীয় এন জি ও সমুহের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহনে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয় এবং Charter of Demands বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ধারনা ও প্রয়োজনীয়তার কথা পৌছে দেবার লক্ষে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখিত অনুষ্ঠানগুলো গ্রহনের পাশাপাশি ব্লাস্ট যথাক্রমে সিলেট, মাদারীপুর, খুলনা, বগুড়া এবং যশোরে ৫টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এতে সকল স্তরের মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়।

বর্তমান পরিস্থিতিঃ সরকারী উদ্যোগ

দীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনার প্রক্রিয়া পার হয়ে অবশেষে ১৯৯৯ এর ৪ এপ্রিল আইন মন্ত্রনালয় কর্তৃক আইনটির চূড়ান্ত খসড়া ক্যাবিনেটে প্রেরিত হয়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী এ সময় খসড়া বিলটি নিয়ে উত্থাপিত কতিপয় আপত্তির প্রেক্ষিতে আইনটি পূনরায় পর্যালোচনার জন্য ক্যাবিনেট একটি উচ্চ পর্যায়ের সাব-কমিটি গঠন করে। এই সাব-কমিটির সদস্য ছিলেন আইন মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ এস কে সাদেক, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, এবং বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী খ ম জাহাঙ্গীর ।

এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কয়েকদফা বৈঠকের পর নভেম্বরে পরিমার্জিত একটি খসড়া নিয়ে সাব-কমিটির সদস্যবৃন্দ ঐক্যমতে পৌছান। ২০০০ সালের জানুয়ারীতে

মানবাধিকার কমিশন বিলটি দ্বিতীয়বারের মতো মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে এজেন্ডা হিসাবে নির্ধারিত হয়। তবে আমাদের ধারনা অদ্যাবধি বিলটি আইনে পরিনত করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে বিলম্বিত হচ্ছে।

গত ১৩. ৩. ২০০০ তারিখে সাপ্তাহিক চলতি পত্রে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, গত ২ জানুয়ারি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব মানবাধিকার কমিশন বিল নিয়ে কিছু আপত্তি জানান যা বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ায় সম্ভবত দীর্ঘায়িত করছে। উল্লেখিত রিপোর্ট অনুযায়ী বিলটির ব্যাপারে নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপিত হয়েছেঃ

১. বিলে মানবাধিকার লংঘনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করা হয়েছে এর ফলে প্রধানমন্ত্রীসহ সবার বিরুদ্ধে মামলা হবে।

২. মানবাধিকার কমিশন দ্বারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পদে পদে মামলার সম্মুখীন হতে হবে। এতে তাদের জন্য এক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদে বিরত থাকার প্রবনতা দেখা দেবে।

৩. মানবাধিকার লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে মামলা দায়ের করার বিধান থাকলে এনজিওরা সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করবে। আসলে এর পরিবর্তে এনজিওদের নিয়ন্ত্রনের বিধান থাকা প্রয়োজন ।

৪. আদালতে বিচারাধীন মানবাধিকার মামলায় কমিশন অংশ নিলে সরকারী কর্মকর্তারা বিব্রত বোধ করবেন। উপরন্তু কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে আপীলেরও কোন সুযোগ নেই।

৫. এ কমিশন বাস্তবায়িত হলে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও হরতালের সময় শান্তিরক্ষীরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেনা।

৬. এ কমিশন হলে বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োগ দুঃসাধ্য হবে।

৭. এ কমিশন হলে কারাবন্দীরাও মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ জানাবে।

স্বরাষ্ট্র সচিব সর্বশেষে বলেছেন যে, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙঘনের অভিযোগ থাকলে যেনো কেবল সতর্ক করে দেওয়া হয় বা বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অর্থাৎ তাদের যেনো প্রচলিত অর্থে শাস্তি দেওয়া না হয়।

পরিশেষে গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারী খসড়া বিলটি পুনরায় ক্যাবিনেটের আলোচনায় স্থান পায়।

গত ৭ই মার্চ ডেইলী স্টার এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী উক্ত বিলটির একটি ধারা সংবিধান পরিপন্থী বলে মনে করায় ক্যাবিনেট সম্প্রতি বিলটিকে সংশোধনের জন্য পুনরায় সাব-কমিটিতে প্রেরন করেছে এবং উক্ত সংশোধনের সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সুপারিশ সমুহকেও বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছে।

পত্রপত্রিকায় এ জাতীয় রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত আইন পাশের দীর্ঘসূত্রীতায় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে বলে আমাদের ধারনা। মানবাধিকার কমিশন গঠন সংক্রান্ত সরকারের একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সময়োপযোগী উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিলম্ব মোটেও কাঙ্খিত নয়। আমরা আশাবাদী যে সরকার অবিলম্বে মানবাধিকার কমিশন বিলটি আইনে পরিনত করতে উদ্যোগী হবেন। আমরা লক্ষ্য করেছি মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে তার সহাস্রাব্দের প্রথম বক্তৃতায় মানবাধিকার কমিশন গঠনে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন।

সরকারের মানবাধিকার কমিশন গঠনের অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় অতি সম্প্রতি ১৩-১৪ই এপ্রিল, ২০০০ সালে প্যারিসে দাতা গোষ্ঠীর বৈঠকে অর্থমন্ত্রীও অচিরেই মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রক্রিয়ার কথা পুনঃ ব্যক্ত করেছেন। সে সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত তিন বছরে বিভিন্ন সময় একটি শক্তিশালী স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মানবাধিকার কমিশন গঠন সম্পর্কে তার সরকারের দেয় প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেছেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের এ প্রক্রিয়া অতি সত্বর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

দিল আফরোজ
ও
নওরীন তামান্না সিকদার

আমাদের আহবান

সরকার এবং বিশেষতঃ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এবং আইনমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শক্রমে মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত আইনের যে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়েছে তাতে সামান্য কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও আমাদের ধারনা এই আইনটি একটি শক্তিশালী, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভিত্তি প্রদান করতে পারবে।

অতএব আইনের খসড়াটি সংসদে উত্থাপিত এবং সংসদ কর্তৃক বিবেচিত হয়ে আইনে পরিনত হওয়া আমাদের কাম্য। অনতিবিলম্বে এই আইন অনুযায়ী জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হলে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া আশ্বাস ও সদিচ্ছার আশু বাস্তবায়ন হবে বলে আমরা আশা করছি।

অনতিবিলম্বে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনে সকল প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা আহবান জানাচ্ছি।

বিল নং ....., ১৯৯৯

বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন স্থাপনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকার রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসাবে স্বীকৃত;

এবং যেহেতু মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ সরকারের মূল উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত;

এবং যেহেতু মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে একটি কমিশন স্থাপন করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা। - বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "কমিশন" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;

(খ) "চেয়ারপার্সন" অর্থ কমিশনের চেয়ারপার্সন;

(গ) "জন সেবক" অর্থ দন্ডবিধির Section 21 এ public servant (জনসেবক) যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থ;

(ঘ) "দন্ডবিধি" অর্থ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860);

(ঙ) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

(চ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(ছ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(জ) "মানবাধিকার" অর্থ সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত ব্যক্তি জীবন, স্বাধীনতা, সমতা এবং মর্যাদা সম্পর্কিত অধিকার বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল, যে নামেই অভিহিত হউক, এর অন্তর্ভুক্ত এবং বাংলাদেশে আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য অধিকার;

(ঝ) "রাষ্ট্রপতি" অর্থ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২ এ সংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রপতি;

(ঞ) "সদস্য" অর্থ কমিশনের কোন সদস্য এবং চেয়ারপার্সনও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন;

(ট) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৩। বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা। - (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে একটি কমিশন স্থাপিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং কমিশনের নামে উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। কমিশনের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি। - কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং ইহা, প্রয়োজনবোধে, দেশের অন্য যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। কমিশনের গঠন, ইত্যাদি। - (১) একজন চেয়ারপার্সন ও চারজন সদস্য, যাহাদের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হইবেন, সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) মানবাধিকার বিষয়ে জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এমন নাগরিকদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্য নিয়োগ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রপতি চেয়ারপার্সন ও অন্যান্য সদস্যকে নিয়োগদান করিবেন, যথাঃ-

(ক) প্রধানমন্ত্রী, যিনি কমিটির চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি;

(গ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;

(ঘ) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলের নেতা;

(৩) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূণ্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৪) চেয়ারপার্সন এবং অন্যান্য সদস্য কমিশনের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং তাহাদের বেতন, ভাতা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক, উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, নির্ধারিত হইবে এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্যের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তে তাহার নিয়োগের পর এমন তারতম্য করা যাইবে না যাহা তাহার পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে।

(৫) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

৬। সদস্যদের মেয়াদ। - (১) কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ হইতে গণনা করিয়া ৩ বৎসর মেয়াদে চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং তাঁহারা পুনঃনির্য়োগের যোগ্য হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সত্তর বৎসর পূর্তির পর কোন ব্যক্তি চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে বহাল থাকিবেন না।

৭। পদত্যাগ। - ধারা ৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার অথবা, ক্ষেত্রমত, সত্তর বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৮। সদস্যের অপসারণ। - সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কমিশনের চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য অপসারিত হইবেন না।

৯। সদস্যদের অক্ষমতা। - কোন ব্যক্তি চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে তিনি উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর বা অন্য কোনভাবে অব্যাহতি নেওয়ার পর প্রজাতন্ত্রের কর্মে লাভজনক কোন পদে বহাল হইবেন না।

১০। অস্থায়ী চেয়ারপার্সন। - চেয়ারপার্সনের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারপার্সন তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে, শূণ্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারপার্সন পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। কর্মকর্তা ও কর্মচারী। - (১) কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একজন নির্বাহী পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) নির্বাহী পরিচালক কমিশনের সচিব হিসাবে কার্য করিবেন, কমিশনের অফিস পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং চেয়ারপার্সন কর্তৃক অর্পিত এবং নির্দেশিত কমিশনের যে কোন দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। কমিশনের সভা, ইত্যাদি। - (১) চেয়ারপার্সন কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে কমিশন সভায় মিলিত হইবে।

(২) কমিশন উহার কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রন করিবে।

(৩) কমিশনের সকল আদেশ ও সিদ্ধান্ত নির্বাহী পরিচালক বা চেয়ারপার্সন হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

১৩। সমন্বয়কারী।- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী সরকার, জাতীয় সংসদ ও কমিশনের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪। কমিশনের কার্যাবলী ঃ- কমিশন নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথাঃ

(ক) সংবিধানে বিধৃত ও প্রদত্ত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অনুকূলে বলবৎকরন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পরিবীক্ষন করা এবং এই প্রেক্ষিতে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ, বিচার বিভাগ ও জাতীয় সংসদ মানবাধিকার প্রয়োগ ও প্রসারণের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে সুশীল সমাজকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;

(খ) কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা সংগঠন বা জনসেবক কর্তৃক মাবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা বা অনুরূপ লংঘন প্রতিরোধে অবহেলা করা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতঃই বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা;

(গ) সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে, আদালতে বিচারাধীন মানবাধিকার লংঘন বিষয়ক অভিযোগের কার্যধারায় অংশগ্রহণ করা;

(ঘ) জেল বা চিকিৎসা, সংস্কার, সংরক্ষণ বা কল্যানের জন্য মানুষকে আটক রাখা হয় সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন এমন কোন স্থানের বাসিন্দাদের বসবাসের অবস্থা পরিদর্শন করা এবং তৎভিত্তিতে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করা;

(ঙ) মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(চ) সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ মানবাধিকার উপভোগের পথে বাধা স্বরূপ বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ছ) চুক্তি এবং মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং উহাদের বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(জ) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এর সহিত সংগতি সাধনের প্রয়াসে কোন প্রস্তাবিত আইনের সাদৃশ্য পরীক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের সহিত উহাদের সমন্বয় নিশ্চিত করার স্বার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সংশোধন সুপারিশ করা;

(ঝ) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের অনুমোদন বা উহাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;

(ঞ) মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা এবং পরিকল্পনা তৈরী করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানে উহাদের বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করা;

(ট) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে মানবাধিকার শিক্ষার প্রচার এবং প্রকাশনা এবং অন্যান্য উপায়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা;

(ঠ) মানবাধিকার বিষয়ে বে-সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ প্রদান করা;

(ড) কমিশনের কার্যাবলীর বা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয়ের আলোচনার ব্যবস্থা করা;

(ঢ) মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনে প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোন কার্য করা।

১৫। তদন্ত সম্পর্কিত ক্ষমতা।- (১) এই আইনের অধীন কোন অভিযোগের তদন্তের ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে, কমিশনের ঐ সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে যেসব ক্ষমতা দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন মামলা বিচারকালে কোন দেওয়ানী আদালতের থাকে, যথাঃ-

(ক) সাক্ষীর সমন ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং শপথের মাধ্যমে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোন দলিল উদঘাটন এবং উপস্থাপন করা;

(গ) শপথের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ;

(ঘ) কোন অফিস হইতে পাবলিক রেকর্ড বা উহার অনুলিপি তলব করা;

(ঙ) সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ এবং দলিল পরীক্ষা করার জন্য পরোয়ানা জারী করা।

(চ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

(২) কমিশনের মতে তদন্তের কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় বা সংশ্লিষ্ট কোন তথ্য সরবরাহ করার জন্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপ ভাবে নির্দেশিত ব্যক্তি দন্ড বিধির section 176 ও 177 এর অর্থে আইনতঃ উহা সরবরাহ করিতে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে,বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) কমিশনের সম্মুখে বা দৃষ্টিগ্রাহ্যের মধ্যে দন্ডবিধির section 175, 178, 179, 180 বা 228 এ বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, কমিশন, ফৌজদারী কার্যবিধিতে বিধৃত বিধান অনুযায়ী অপরাধ বিষয়ক ঘটনা এবং অপরাধীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া, মামলাটি বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট অপরাধীর বিরূদ্ধে অভিযোগ শুনানীর ব্যবস্থা করিবেন যেন তাহার নিকট মামলাটি ফৌজদারী কার্যবিধির section 346 এর অধীন প্রেরণ করা হইয়াছে।

(৪) কমিশনের সম্মুখে প্রত্যেক কার্যধারা দন্ডবিধির section 193 এবং 228 এর তাৎপর্যাধীন এবং section 196 এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধির section 195 এবং chapter XXXV এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

১৬। অনুসন্ধান।- (১) তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কিছুর জন্য অনুসন্ধান পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশন সরকারের কোন কর্মকর্তা বা অনুসন্ধান সংস্থার সেবা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন অনুসন্ধান পরিচালনাকল্পে যে কর্মকর্তা বা সংস্থার সেবা উক্ত উপ-ধারার অধীন গ্রহণ করা হয় সেই কর্মকর্তা বা সংস্থা, কমিশনের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে -

(ক) কোন ব্যক্তিকে সমন করিতে এবং তাহার উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে;

(খ) কোন দলিল উৎঘাটন এবং উপস্থাপন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে;

(গ) কোন অফিস হইতে কোন পাবলিক রেকর্ড বা উহার অনুলিপি পাঠাইতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি কর্তৃক কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানের সময় বিবৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে ধারা ১৫ এর বিধান যেই ভাবে প্রযোজ্য হয় উক্ত বিধান সেইভাবে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা বা সংস্থার সম্মুখে প্রদত্ত বিবৃতি প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন যেই কর্মকর্তা বা সংস্থার সেবা গ্রহণ করা হইবে, সেই কর্মকর্তা বা সংস্থার অনুসন্ধানের রিপোর্ট কমিশনের নিকট, কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, দাখিল করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন পেশকৃত রিপোর্টের মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হইলে উহার যথার্থতা সর্ম্পকে কমিশনকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিশন তদকর্তৃক যথাযথ বিবেচিত যে কোন প্রকার তদন্ত (অনুসন্ধান পরিচালনাকারী ব্যক্তি বা সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদসহ) করিতে পারিবে।

১৭। কমিশনের নিকট প্রদত্ত বিবৃতি।- কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানকালে কোন ব্যক্তির, কমিশন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাবের বিপরীতে, প্রদত্ত বিবৃতি বা বক্তব্যের জন্য তাহার বিরূদ্ধে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা রুজু করা যাইবে না বা উক্ত বিবৃতি বা বক্তব্য তাহার বিরূদ্ধে কোন ফোজদারী বা দেওয়ানী কার্যধারায় ব্যবহার করা যাবে না, তবে উক্তরূপ বিবৃতি বা বক্তব্যের মধ্যে কোন মিথ্যা সাক্ষ্য থাকিলে তজ্জন্য তিনি অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

১৮। ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এমন ব্যক্তিদের শুনানী ।- এই আইনের অধীন তদন্তের কোন পর্যায়ে কোন ব্যক্তির আচরণ তদন্ত করা কমিশন যদি প্রয়োজন মনে করে বা কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তদন্তের কারনে কোন ব্যক্তির সম্মান ক্ষুন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে কমিশন উক্ত ব্যক্তিকে শুনানীর এবং তাহার পক্ষে সাক্ষী উপস্থাপন করার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবে।

১৯। অভিযোগের উপর তদন্ত ।- (১) মানবাধিকার লংঘনের কোন অভিযোগ তদন্ত করার সময় কমিশন সরকার বা সরকারের অধীনস্ত যে কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা হইতে, এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে, কোন তথ্য আহবান করিতে পারিবে এবং উক্ত সময়সীমার মধ্যে উক্ত তথ্য যদি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কমিশন স্বীয় উদ্যোগে অভিযোগের তদন্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রার্থীত তথ্য বা রিপোর্ট প্রাপ্তির পর যদি কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আর কোন তদন্তের প্রয়োজন নাই বা সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করা হইয়াছে বা ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে কমিশন অভিযোগের তদন্ত না করিয়া অভিযোগকারীকে উক্ত কার্যক্রম বা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবে।

২০। তদন্ত পরবর্তী কার্যক্রম।- (১) এই আইনের অধীন কোন তদন্ত সমাপ্তির পর কমিশন নিম্নবির্ণিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা-

(ক) অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইলে, কমিশন সংশ্লিষ্ট কার্যধারা বাতিল করিয়া দিবে এবং উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে আর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন না;

(খ) অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে, কমিশন-

অ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু বা অন্য কোম আইনগত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে এবং একই সাথে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি ধরনের মামলা বা অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যথাযথ হইবে তাহা সুপারিশের মধ্যে উল্লেখ করিবে;

আ) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ এর অধীন আদেশ বা নির্দেশযোগ্য হইলে, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে আবেদন দাখিল করানোর ব্যবস্থা করিতে পারিবে বা কমিশন স্বয়ং উক্ত বিভাগে আবেদন পেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীন কোন বিষয়ে কমিশন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পরিবারকে উহার বিবেচনায় যথাযথ সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করার জন্য সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করিতে পারিবে ।

(৩) কমিশন তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধিকে সরবরাহ করিবে ।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন সুপারিশসহ তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি কমিশন সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত বা প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কমিশনকে, রিপোর্ট প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে, অবহিত করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সরকার বা উক্ত কর্তৃপক্ষের কমিশনের সিদ্ধান্ত বা সুপারিশের সহিত মতভেদ থাকে অথবা সরকার বা উক্ত কর্তৃপক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয় বা অস্বীকার করে, তাহা হইলে উক্ত মতভেদ, অসমর্থতা বা অস্বীকারের কারণ উল্লেখ করিয়া উপরিউক্ত সময়সীমার মধ্যে কমিশনকে অবহিত করিবে।

(৫) কমিশন সংশ্লিষ্ট তদন্ত রিপোর্টের সারার্থ এবং উক্ত রিপোর্টের উপর কমিশনের সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ তদকর্তৃক যথাযথ বিবেচিত পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, গুরুত্ব বিবেচনায় কোন তদন্ত রিপোর্টের সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ জনগনের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে কমিশন উক্ত রিপোর্ট সম্পূর্ণ বা, ক্ষেত্রমত, অংশবিশেষ প্রকাশ করিবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন রিপোর্টের সারার্থ প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই, সেই ক্ষেত্রে উক্ত রিপোর্টের কোন কিছুই প্রকাশ করার প্রয়োজন হইবে না।

২১। কমিশনের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন।-(১) প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের মার্চ মাসের মধ্যে কমিশন পূর্ববর্তী বৎসরে উহার কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদনের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে অন্যান্যের মধ্যে, কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে সেই ক্ষেত্র এবং কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ, কমিশন যতদুর অবগত ততদুর, লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রতিবেদন ও স্মারকলিপি প্রাপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন উপস্থাপিত প্রতিবেদনের উপর আলোচনা উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক কোন সংসদ-সদস্য যেদিন আলোচনা উত্থাপন করিতে চাহেন তিনি, উহার অন্যূন দুই দিন পূর্বে জাতীয় সংসদের সচিবের নিকট, অন্যূন আরো ৫ জন সংসদ-সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত, নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশটি স্পীকার গ্রহণ করিয়া প্রতিবেদনটির উপর আলোচনার জন্য তাহার মতে যথাযথ সময় নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন উপস্থাপিত প্রতিবেদনটির উপর জাতীয় সংসদে অলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত, যদি থাকে, বা মন্তব্য জাতীয় সংসদের সচিব কমিশনকে অবহিত করিবেন।

২২। মানবাধিকার ট্রাষ্ট ফান্ড।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মানবাধিকার ট্রাষ্ট ফান্ড নামে একটি ট্রাষ্ট ফান্ড গঠিত হইবে।

(২) মানবাধিকার ট্রাষ্ট ফান্ড, অতঃপর এই ধারায় ট্রাষ্ট ফান্ড বলিয়া উল্লেখিত, এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধির বিধান সাপেক্ষে, কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কমিশন ট্রাষ্ট ফান্ডের ট্রাষ্টি বোর্ড হিসাবে কার্য করিবে।

(৩) ট্রাষ্ট ফান্ড হইতে কমিশনের সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) সরকার স্থায়ী আমানত হিসাবে .....কোটি টাকা কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিবে এবং উক্ত স্থায়ী আমানত হইতে অর্জিত সুদ সরকারের অনুদান হিসাবে ট্রাষ্ট ফান্ডে জমা হইবে।

(৫) ট্রাষ্ট ফান্ডে নিম্নবর্ণিত অর্থও জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান;

(খ) দান (donations) এবং স্থায়ীভাবে প্রদত্ত অর্থ (endowments)

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৬) ট্রাষ্ট ফান্ডের যে অর্থ সহসা খরচের জন্য প্রয়োজন হইবে না সেই অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করা হইবে।

২৩। বাজেট।- কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কমিশনের কি পরিমান অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

২৪। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি

পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোন সদস্য বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২৫। কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা দান।- কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

২৬। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা আদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, কমিশন, কোন সদস্য বা কমিশন বা সরকারের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বা সরকার বা কমিশনের কর্তৃত্বাধীন কোন প্রকাশনা, রিপোর্ট বা কার্যধারার বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

২৭। জনসেবক।- প্রত্যেক সদস্য, কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত এবং এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনের জন্য কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা দন্ডবিধির Section 21 এ Public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে Public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রীকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল এবং যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) সদস্যদের বেতন ও ভাতা এবং চাকুরী অন্যান্য শর্তাবলী ;

(খ) কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি, বেতন ও ভাতা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী;

(গ) নির্ধারিতব্য অন্য যে কোন বিষয়।

২৯। অসুবিধা দূরীকরণ।- এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩০। ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ। - এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনুদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (Authentic English text) নামে অভিহিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

চলন্তিপত্র

মার্চ ১৩, ২০০০

রাজনৈতিক শক্তির বিরোধকে ব্যবহার করে। কিন্তু কারামুক্ত এরশাদের 'কবিতা' হয়ে পড়লো দুর্লভ। বিশেষ নারীর সঙ্গে 'বিশেষ সম্পর্ক' নিয়ে এরশাদ নিজেই হয়ে পড়লেন খোলামেলা। সেই বিশেষ নারীকে 'বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ' করবার আইনি পরামর্শ করলেন। এমনি সময়ে বহুকালের পুরাতন দু সহযোগী আনোয়ার-মোয়াজ্জেম বিকট ঘেউ ঘেউ করে প্রভু এরশাদকে জড়কে দিলো। আনোয়ার-মোয়াজ্জেমের 'যুক্তি' ছিলো এরশাদ-জায়া তথা শাদ-জননী রওশন।

এমনি পর্যায়ে 'শাদ' নামক চরিত্রটির অস্তিত্ব আমরা জানতাম না। রাজনীতিতে পাওয়ার হতে এরশাদ-পেন্ডুলাম একবার এদিকে একবার ওদিকে ছুটছে, আর দল ভাঙছে, প্রকট অস্থিরতা তার। বিশ্ব মিত্র সাজার অভিনয়ে অভিনয়ে এরশাদ যখন ক্লান্ত, চারদলীয় জোটের তাঁদেরও যখন রাজনীতি খুড়ের মুঠোয় আনা যাচ্ছে না, এমনি সময়ে হঠাৎ শাদ বোমা বিস্ফোরণ। কিশোরী-অপহরণ মামলায় ধান্য হাজতে শাদ। শাদের প্রকৃত বাবা-মা কে সে বিতর্কটি জাতি ভুলে গিয়েছিলো। হঠাৎ নারীঘটিত ঘটনায় কিশোর-তরুণ শাদ নাটকীয়ভাবে গ্রেফতার হবার পর বাজারে রসিকতা ছড়িয়ে পড়লো, না: এরশাদই শাদের প্রকৃত 'জনক' এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কেউ বললেন, পিতৃভক্ত পুত্র, বাপ-কা বেটা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের বাজার কাটতি পাগল পত্রিকাগুলো এ খবরে পাগল হয়ে গেলো। একটিবার কেউ ভাবলেন না এ পৃথিবীর একজন কিশোর-তরুণ শাদ-এর কথা। এ বয়সী আপনার সন্তানটিও তো এমন ভুল করতে পারতো! এ শাদ হীরের চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নিলেও আজন্ম-বিতর্কিত। যদি সত্যিই তার বাবা-মা আর কেউ হন, তাহলে শাদ যেদিন তা জানবে, সে মুহূর্তটার কথা ভাবুন। টিনেজার শাদ পৃথিবীর কোনো দেশে গিয়েই স্থির হতে পারছে না। শাদ গুলশান-বনানী-বারিধারার ছেড়ে ওরা যে কোনো কিশোরের মুক্তবিহঙ্গ-জীবনযাপনই করছে। এমন [illegible] পে দেখলে। তদুপরি পিতা হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিটির যোগ সাম্রাজ্যের কর্মকাণ্ড কী; এ বয়সে তো আর কম জানা হয়নি শাদ-এর।

এমনি পরিস্থিতিতে ভোগী এরশাদের ভুক্তভোগী সন্তান শাদ। সব জয়নামফিল, আপনার, কাটিয়ে ভোগী পরিমণ্ডলের মাঝেও শাদ সুসন্তান হয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাক, দুটি সন্তানের জনক হিসেবে এ-ই আমার ঐকান্তিক কামনা। ভোগসর্বস্ব রাজনীতি-অর্থনীতির, করুণ এক শিকার শাদ ছেলেটি।

ক্ষমতার নিয়ামকের উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় ওও এরশাদকে পক্ষে পাবার দ্বন্দ্ব চলছে। কথা দিয়ে কথা না রাখার 'বেঈমান' এরশাদকে কাবু করার লক্ষ্যে শাদ-এর ঘটনাটিকে কদর্যভাবে ব্যবহার করেছে ক্ষমতাসীনরা। আর স্বামী হত্যাকারী হিসেবে একদিন যে স্বৈরাচারকে অভিযুক্ত করেছিলেন বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া, সেই স্বামী হত্যাকারীকে সঙ্গে নিয়েই জোট গড়ার ভয়ঙ্কর 'ক্ষমতা-তৃষ্ণা' প্রদর্শন করে চলেছেন, 'শাদ' দমনে এখন তিনিও অনুপম। ওও এরশাদকে যিনি পাবেন, ক্ষমতা যে যাবে তারই পানে-বোধ করি ওও, ভোগী এরশাদের জন্য এ কারণেও ভুক্তভোগী শাদ।■

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিশ্রুত মানবাধিকার কমিশন গঠনের অধিকার এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ক্যাবিনেট সাব-কমিটির অনুমোদন সত্ত্বেও অর্থহীন এক সচিবের আপত্তিতে প্রধানমন্ত্রী কিছুটা নারাজ হয়ে আছেন।

সাব-কমিটির সদস্য ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, টিএন্ডটি মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ব. হ. আহমেদ এবং আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু। আওয়ামী লীগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এ কমিটি এপ্রিল থেকে পরবর্তী মাসগুলোতে ক দফা বৈঠক করেন। সবশেষ নানান পরিমার্জিত একটি খসড়া নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেন তাঁরা। এ বছরের ৩ জানুয়ারি মানবাধিকার কমিশন বিল দ্বিতীয় বারের মতো মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে এজেন্ডা হিসেবে নির্ধারিত হয়।

এরই মাঝে ৩ জন সচিব সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, সচিবদের এ সক্রিয়তায় নেতৃত্ব দেন সদ্য অবসরে যাওয়া স্বরাষ্ট্র সচিব শফিউর রহমান। তার প্রতি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আস্থাকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি তিন পৃষ্ঠার লিখিত আপত্তি পেশ করেন। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এ আপত্তি পেশ হয় ও মানুষটি-মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক

বহুল আলোচিত মানবাধিকার কমিশন মন্ত্রীদের সম্মতি ছিলো; আটকে দিলেন সচিব

আলতাফ পারভেজ/ মো. রফিকুজ্জামান

মানবাধিকার কমিশন বিল তৈরির পটভূমি

মানবাধিকার কমিশন নিয়ে কাজ শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। ইউএনডিপির অর্থায়নে এ নির্দিষ্ট প্রজেক্ট। উৎপত্তি শুরু হয় ভারত, নেপালসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানবাধিকার কমিশনের কাঠামো, দায়িত্ব, লক্ষ্য-ইত্যাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে। অতিসত্বর বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার কমিশন গঠনের [illegible] ঠিক করেছে তার আলোকেই কার্যক্রম চলে। তৎকালীন আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু প্রথম থেকে বিশেষ আন্তরিক ও সক্রিয় ভূমিকা পালন এর কাজই সম্পন্ন হয়ে আসে। ১৯৯৭-এর ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে বিভিন্ন সমাজের নেতাদের এক সভায় জড়ো করে আনুষ্ঠানিকভাবে মানবাধিকার কমিশনের আইনগত কাঠামোর খসড়া পেশ করেন আইনমন্ত্রী।

সে থেকে পরবর্তী দু বছর এর সংশোধনের পর্ব চলে। দেশের বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মীদের সুপারিশ যুক্ত করে খসড়াটি নবায়ন করে পুনর্বিন্যাস হয়। Consultation Process-টি ছিলো দীর্ঘ এবং ব্যাপক। বিদেশী অনেক এক্সপার্ট, প্রতিনিধিরাও মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও খসড়াটি তৈরির প্রক্রিয়ায় মতামত দিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী [illegible] এ কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন কয়েক দফা।

শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত খসড়া ক্যাবিনেটে যায় গত বছরের ৪ এপ্রিল। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, মন্ত্রিসভায় প্রথম আপত্তি ওঠে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের তরফ থেকে। আপত্তির কারণে আইনটি পর্যালোচনার জন্য ক্যাবিনেট একটি সাব-কমিটি গঠন করে। এ মন্ত্রিসভা

বৈঠকের ঠিক আগের দিন।

লিখিত আপত্তি পত্রের [illegible] 'সুপারিশ' প্রধানমন্ত্রী [illegible] কমিশন বিল আটকে যায় সেদিন। ক্যাবিনেট বৈঠকে [illegible] নিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতির এ বক্তব্য।

কী আছে প্রস্তাবিত বিলে

মূলত দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রস্তাব। পৃথিবীর অনেক দেশে এ কমিশন আছে। 'মানবাধিকার' বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অঙ্গীকারও বটে।

বিল অনুযায়ী সংসদে অনুমোদিত হলে 'মানবাধিকার কমিশন' সর্বোচ্চ চারজন সদস্য ও একজন চেয়ারপার্সন নিয়ে গঠিত হতো। প্রধানমন্ত্রী, সংসদের বিরোধী দল নেতা, প্রধান বিচারপতি এবং আইনমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি তিন বছর মেয়াদে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ দেয়ার কথা।

এ কমিশন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানবাধিকার বিষয়ে দেশের নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও সংসদকে স্বাধীনভাবে পরামর্শ ও সহায়তা দেয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতো। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্ত করারও অধিকার থাকতো তার। সে অধিকার হতো দেওয়ানী

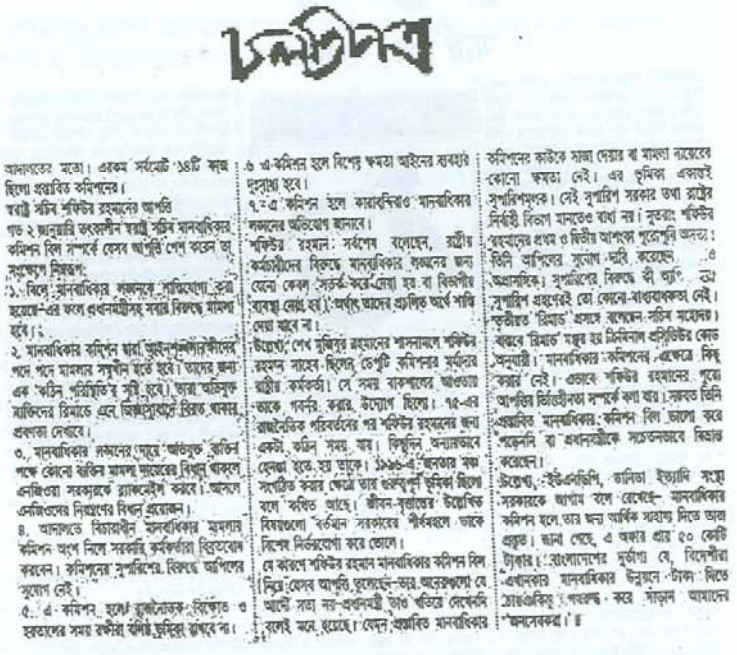

চলতিপত্র

আদালতের মতো। এরকম সর্বমোট ১৪টি ক্ষমতা ছিলো প্রস্তাবিত কমিশনের।

স্বরাষ্ট্র সচিব শফিউর রহমানের আপত্তি

গত ২ জানুয়ারি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব মানবাধিকার কমিশন বিল সম্পর্কে যেসব আপত্তি পেশ করেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. বিলে মানবাধিকার লংঘনকে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে—এর ফলে প্রধানমন্ত্রীসহ সবার বিরুদ্ধে মামলা হবে।;

২. মানবাধিকার কমিশন দ্বারা আইনশৃঙ্খলারক্ষীদের পদে পদে মামলার সম্মুখীন হতে হবে। তাদের জন্য এক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদে বিরত থাকার প্রবণতা দেখাবে।

৩. মানবাধিকার লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনো ব্যক্তির মামলা দায়েরের বিধান থাকলে এনজিওরা সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করবে। আসলে এনজিওদের নিয়ন্ত্রণের বিধান প্রয়োজন।

৪. আদালতে বিচারাধীন মানবাধিকার মামলায় কমিশন অংশ নিলে সরকারি কর্মকর্তারা বিব্রতবোধ করবেন। কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ নেই।

৫. এ কমিশন হলে দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ ও হত্যাকাণ্ডের সময় রক্ষীরা যথাযথ ভূমিকা রাখবে না।

৬. এ কমিশন হলে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ব্যবহার দুঃসাধ্য হবে।

৭. এ কমিশন হলে কারাবন্দিরাও মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ জানাবে।

শফিউর রহমান সর্বশেষ বলেছেন, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের জন্য যেনো কেবল সতর্ক করে দেয়া হয় বা বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। অর্থাৎ তাদের প্রচলিত অর্থে শাস্তি দেয়া যাবে না।

উল্লেখ্য, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে শফিউর রহমান সাহেব ছিলেন ডেপুটি কমিশনার মর্যাদার রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা। সে সময় বাকশালের আওতায় তাকে গভর্নর করার উদ্যোগ ছিলো। ৭৫-এর রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর শফিউর রহমানের জন্য একটা কঠিন সময় যায়। কিছুদিন অন্যায়ভাবে জেলখানায় থাকতে হয় তাকে। ১৯৯৬-এ জনতার মঞ্চ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো বলে কথিত আছে। জীবন-বৃত্তান্তের উল্লেখিত বিষয়গুলো বর্তমান সরকারের শীর্ষমহলে তাকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

যে কারণে শফিউর রহমান মানবাধিকার কমিশন বিল নিয়ে যেসব আপত্তি তুলেছেন—তার অনেকগুলো যে আদৌ সত্য না—প্রধানমন্ত্রী তাও খতিয়ে দেখেননি বলেই মনে হয়েছে। যেমন প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশনের কাউকে সাজা দেয়ার বা মামলা দায়েরের কোনো ক্ষমতা নেই। এর ভূমিকা একান্তই সুপারিশমূলক। সেই সুপারিশ সরকার তথা রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ মানতেও বাধ্য নয়। সুতরাং শফিউর রহমানের প্রথম ও দ্বিতীয় আশংকা পুরোপুরি অমূলক; তিনি আপিলের সুযোগ দাবি করেছেন, এও অপ্রাসঙ্গিক। সুপারিশের বিরুদ্ধে কী আপিল? ঐ সুপারিশ গ্রহণেরই তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তৃতীয়ত 'রিমান্ড' প্রসঙ্গে বলেছেন সচিব মহোদয়। বাস্তবে রিমান্ড মঞ্জুর হয় ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড অনুযায়ী। মানবাধিকার কমিশনের এক্ষেত্রে কিছু করার নেই। এভাবে শফিউর রহমানের পুরো আপত্তির ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে বলা যায়। সম্ভবত তিনি প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশন বিল ভালো করে পড়েননি বা প্রধানমন্ত্রীকে সচেতনভাবে বিভ্রান্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, ইউএনডিপি, ডানিডা ইত্যাদি সংস্থা সরকারকে আগাম বলে রেখেছে— মানবাধিকার কমিশন হলে তার জন্য আর্থিক সাহায্য দিতে তারা প্রস্তুত। জানা গেছে, এ অংক প্রায় ৫০ কোটি টাকার। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, বিদেশীরা এখানকার মানবাধিকার উন্নয়নে টাকা দিতে চাইলেও কিছু পছন্দ করে না আমাদের "আমলাতন্ত্র"।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত উল্লেখিত আপত্তিঃ প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন মহল থেকে মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা হচ্ছে এই বলে যে মানবাধিকার কমিশন সরকারী কাজে বা সরকারের উপর খবরদারি করবে। সাধারনতঃ মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলী এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্টীয় সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করা। মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা সাধারনতঃ সুপারিশমূলক হয়ে থাকে এবং এর সিদ্ধান্ত সরকারী সংস্থার উপর বাধ্যতামুলক নয়। কমিশনের সুপারিশ সমুহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব সাধারনত সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সংবিধানে বর্ণিত ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা এবং এ উপলক্ষে পরবর্তীকালে প্রণীত আইনেও ন্যায়পালকে সুপারিশ মুলক ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

মানবাধিকার কমিশনের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করনের জন্য প্রস্তাবিত আইনে যথেষ্ট বিধান সম্বলিত হয়েছে। এই দায়িত্বশীলতা দুই ভাবে নিশ্চিত করা হয়ে থাকে:- প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। প্রত্যক্ষভাবে, মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির জন্য অপসারণ করা যাবে। আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য কমিশনের বার্ষিক ব্যয় পরিচালনার হিসাবের রিপোর্ট Audit করার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া কমিশনের কার্যাবলী এবং সুপারিশ সম্বলিত বাৎসরিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদের নিকট উত্থাপিত হবে এবং সাধারন জনগনের জন্যও প্রকাশিত হবে। রিপোর্টের উপর সংসদীয় আলোচনা এবং জনগনের মধ্যে কমিশনের কার্যাবলী সংক্রান্ত ধারনা কমিশনের জবাবদিহিতা এবং দায়িত্বশীলতার ভিত্তি প্রদান করবে।

চলতিপত্রে প্রকাশিত মানবাধিকার কমিশনের বিরুদ্ধে আপত্তি সমুহের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রনিধানযোগ্যঃ

১) মানবাধিকার কমিশন মূলতঃ একটি সুপারিশমূলক সংস্থা, এর শাস্তি প্রদানের কোন ক্ষমতা নেই। এছাড়া মানবাধিকার কমিশনের মামলা করারও আইনগত কোন ক্ষমতা নেই যা শুধু আদালতের উপরই ন্যস্ত।

২) মানবাধিকার কমিশন শুধুমাত্র সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তিগনের নিকট থেকে মানবাধিকার লংঘনের জন্য অভিযোগ গ্রহণ করবে যা মামলার পর্যায়ে পড়বে না।

৩) এনজিওদের মামলা করার কোন ক্ষমতা কমিশনের নিকট দেওয়া হয়নি।এনজিও শুধুমাত্র সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তিগনের পক্ষে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। এ প্রসংঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে কিছু ক্ষেত্রে N.G.Oদের Public Interest Litigation অর্থাৎ জনস্বার্থে আদালতে মামলা করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং শুধুমাত্র অভিযোগ করার ক্ষমতা থেকে কোন ক্রমেই N.G.O. কর্তৃক মানবাধিকার কমিশন নিয়ন্ত্রন করার প্রশ্ন উঠে না।

৪) কমিশন শুধুমাত্র আদালতের মানবাধিকার সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় সহায়তা করবে এবং রায় প্রদানের ক্ষমতা আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এর দ্বারা সরকারী কর্মচারীগন বিব্রতবোধ করবেন এই ধারনা অমূলক।

৫) "কমিশন বাস্তবায়িত হলে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও হরতালের সময় শান্তিরক্ষীরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে না।" - এই ধরনের যুক্তির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। কারণ রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও হরতাল একটি স্বীকৃত গনতান্ত্রিক অধিকার যার সাথে কমিশনের সম্পৃক্ততা নিতান্তই অযৌক্তিক।

৬) "এ কমিশন হলে বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োগ দুঃসাধ্য হবে" - এই অভিযোগের অবতারনা অপ্রাসংগিক। কারণ বিশেষ ক্ষমতা আইনে প্রদত্ত গ্রেফতার কিংবা ডিটেনশন দেওয়ার ক্ষমতা আইনগত কাঠামোর মধ্যে অর্পিত এবং ডিটেনশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের সম্পূর্ণভাবে বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া ।

৭) কমিশন কর্তৃক কারাবন্দীদের অবস্থা পর্যবেক্ষন এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করবে। এই বিধান মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে স্বীকৃত। এটা অনস্বীকার্য্য যে, জেল হাজতে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আজ অপরিহার্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এমেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, মার্কিন যুক্তরাষ্টের বাৎসরিক মানবাধিকার রিপোর্ট, এবং দেশের বিভিন্ন সংস্থা এবং পত্রপত্রিকা প্রায়ই আমাদের দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর বিপরীতে যদি একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ জাতীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা মানবাধিকারের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাহলে এ সংক্রান্ত ভুল বুঝাবুঝির অবসান হবে এবং দেশেরও ভাবমূর্তি উজ্জল হবে।

আবদুল্লাহ-আল-ফারুক

The Daily Star
March 7, 2000

Bureaucracy trying to torpedo move for effective HR body

By Nurul Kabir

A government initiative to set up an independent national human rights commission has drawn stiff resistance from the bureaucracy, active to make it a "toothless institution".

The resistance came recently from the secretariat of the home ministry even after Sheikh Hasina's Cabinet approved a draft Bill seeking constitution of the commission, sources said.

The ministry objected to those provisions of the draft law which, if remain unchanged, would substantially contribute to prevention of human rights violation by government officials in general and law enforcing agencies in particular.

In the first place, the ministry raised objection to the definition of 'human rights'. The draft Bill said that the phrase 'human rights' would mean "the right to personal life, freedom, equality and status guaranteed by the state's constitution, the rights enshrined in international human rights instruments ratified by Bangladesh and those enforceable through any court of the country."

The home ministry found the definition "broad-based" and was "unhappy" as the Bill envisaged violation of the rights as punishable offence. Arguing for trimming the definition, the home ministry secretariat said that it "would enable any person to sue the Prime Minister, Ministers and government officials on charge of human rights violation", while "law enforcing agency people have to face cases very often".

The ministry suggested dropping of another provision that would give the proposed commission the authority to conduct investigation – *suo moto* or on application of victim/s – into allegation of human rights violation, or failure by any person, group, organisation or public servant in preventing violation of human rights. If the provision is not dropped, certain "NGOs working on so-called human rights issues would have the scope for

See page 11 Col7

Effective HR body

From Page 1

blackmailing or embarrassing government officials out of political motives", the ministry argued.

The ministry seems to have ignored the fact that human rights can not be ensured at all without a legal mandate for probing into allegations of human rights violation by any individual or quarter – be it public or private.

The home ministry also objected to another provision that gives the commission the authority to take part in proceedings of cases of human rights violation, subject to prior permission of the court concerned. "An embarrassing situation will be created for government officials, if the commission takes part in court proceedings", the ministry said.

Opposing the idea of "encouraging NGOs in human rights activities", the ministry rather recommended "provisions to ensure proper monitoring and control of NGO activities".

The ministry suggested deleting another provision that allows the commission to recommend financial compensation to the victims or their families. In this regard, the ministry suggested "considering the implications of introducing such a legal provision when the High Court instructed the government and a district magistrate to pay compensation even in the absence of such a provision".

"If the provisions are kept, police officials would be inactive in arresting the accused or interrogating them for fear of being charged with human rights violation. They would also get scared of taking the accused on remand for interrogation", the ministry said.

"Enactment of such a law would make it very difficult for police to play a bold role during hartals and other political demonstrations. Innumerable cases would be filed by demonstrators against police".

It would also create problems for the jail administration, the home ministry observed. "Inmates would have the scope to sue the authorities concerned for human rights violation as the prisons keep inmates much more than their capacities".

The secretariat of the home ministry came up with the observations on January 2, a day after President Shahabuddin Ahmed announced in the Jatiya Sangsad that an independent human rights commission was in the offing.

A Tk 1.5 crore project – Institutional Development of Human Rights in Bangladesh (IDHRB) – was approved by the government of Khaleda Zia in 1995. Sheikh Hasina's government, especially the law ministry, went for implementing the project in March 1996.

Following a lot of field work, discussions and consultative meetings with local and foreign experts, IDHRB authorities submitted the draft Bill in early 1998 seeking setting up of a national human rights commission.

The Cabinet on April 12, 1999 in principle approved the Bill and a law ministry proposal for setting up of a national human rights commission.

The Cabinet however formed a six member ministerial committee headed by Education Minister ASHK Sadequr to review certain legal and technical aspects of the draft legislation. Other members of the committee were Industries Minister Tofail Ahmed, Home Minister Mohammad Nasim, Law Justice and Parliamentary Affairs Minister Abdul Matin Khasharu, State Minister for Textile K M Jahangir and State Minister for Planning Mohiuddin Khan Alamgir.

After three meetings between April and October last year, the ministerial committee proposed certain changes in the draft Bill. However, one of the committee recommendations may eventually affect effective functioning of the proposed commission. It suggested 'deleting' a provision that the executive authorities of the state would co-operate with the commission in discharging its functions.

According to press reports, Prime Minister Sheikh Hasina told President of the UN Human Rights and Equal Opportunity Commission Prof. Alice Tay in Sydney on October 22 last year that her government had approved a draft law, to be placed in the next parliament session, to constitute a national human rights commission.

However, the draft Bill came up again for discussion in the Cabinet meeting on February 28. According to Cabinet sources, the PM found a provision of the proposed law inconsistent with a Constitutional provision which said that the President would act, except in two cases, only on the advice of the Prime Minister.

But the draft Bill that has vested the authority of appointing the commission in the President said that he would made the appointments in consultation with a four member panel comprising the Prime Minister, Speaker, Leader of the Opposition in Parliament and Chief Justice of Bangladesh.

The Cabinet therefore decided to send it back to the ministerial committee to "make the draft consistent with constitutional provisions". But what is alarming is that the Cabinet also asked the ministerial committee to consider the home ministry observations.

Human rights experts believe that the proposed commission, even if set up in the light of the proposed Bill, would not be very effective as it would not have the authority to punish any human rights violator. It would only have the right to recommend punishment. Now, if the government incorporates the home ministry objections in the draft, the commission would eventually be a "toothless institution which would only serve governments to secure foreign aids and grants", they observed while talking to this correspondent.

The Daily Star
April 7, 2000

Expedite establishment of HR Commission

Speakers at a seminar urge government

By Staff Correspondent

The government is taking too long to create the proposed human rights commission and should expedite the process, concluded participants at an open discussion on the issue yesterday.

Organised by the Bangladesh Legal Aid and Services Trust, the seminar was addressed by Suranjit Sengupta, the prime minister's parliamentary affairs adviser, ruling party lawmaker Akhtaruzzaman, Khushi Kabir, Prof. Abrar Chowdhury, Debapriya Bhattachariya from the Bangladesh Institute of Development Studies and Advocate Nizamul Huq Nasim.

Dr Kamal Hossain, a former minister and chief of the Gono Forum chaired the discussion while Dr. Shah Deen Malik made some opening remarks.

A bill to create the commission was drafted in late 1997 and approved by cabinet in April 1999. It was then sent a cabinet committee for review. The secretariat of the ministry of Home Affairs objected to some vital provisions in the bill, slowing down the process.

"What is important is to mobilise those who want change," said Dr. Kamal Hossain. "Our people have been fighting for democracy and human rights since the 1950s. We've been an independent nation for more than 25 years. It's time to build various democratic institutions, braving all impediments."

Suranjit Sengupta, an Awami League legislator, said the government is constitutionally committed to human rights, since democracy and human rights are intertwined. However, he defended the government against the accusation of dilly-dallying.

"Sometimes its better to take time to make a law," said Sengupta. "What is the use of making a law in hurry and amend it a month after its enactment?"

Akhtaruzzaman said he sympathised with those who wanted the process to speed up and assured participants he would do whatever he could to move the process forward.

"But you take it from me that the government will create the commission sooner or later."

Khushi Kabir from *Nijera Kori* said millions of people living in rural areas have been de-

See page 11 col 1

HR Commission

From Page 1

prived of their human rights. People must expose repression whenever they demand an explanation for acts committed by government officials, said Kabir.

Dr. Abrar Chowdhury gave a vivid account of human rights violations across the country. A human rights commission is essential to protect and promote human rights, he said.

Debapriya Bhattacharia said civil and political rights are an important component of a free market economy.

"You cannot have a strong private sector without ensuring fundamental human rights," said Bhattacharia. "Even the officials who have drafted the objections would not agree to read them out in a civilised forum in or outside the country."

The Home Ministry objected to the draft's definition of human rights. The draft stated human rights would mean "the right to personal life, freedom, equality and status guaranteed by the state's constitution, the rights enshrined in international human rights instruments ratified by Bangladesh and those enforceable through any court of the country."

The ministry said the definition was too broad, especially since it would make human rights violations punishable under the law.

If passed, the bill "would enable any person to sue the prime minister, ministers and government officials on charges of human rights violations," while police would "face cases very often."

The ministry suggested the government drop another provision that would allow the commission to conduct investigation – *suo moto* or after an application by a victim. If the provision was not dropped, the ministry argued, certain "NGOs working on so-called human rights issues would be able to blackmail or embarrass government officials for political reasons."

The home ministry also objected to a provision allowing the commission to take part in human rights case with the court's permission. "An embarrassing situation will be created for government officials if the commission takes part in court proceedings."

The ministry recommended a provision to ensure the "proper monitoring and control of NGO activities," instead of "encouraging the NGOs in human rights activities."

The home ministry also said enacting such a law "would make it very difficult for the police to play a bold role during hartals and other political demonstrations. Innumerable cases would be filed against police by the demonstrators."

ভোরের কাগজ
এপ্রিল ৭, ২০০০

কতিপয় আমলার বাধায় মানবাধিকার কমিশন আইন পাস হচ্ছে না

রাষ্ট্রই বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে ❑ গোলটেবিল বৈঠকে অভিমত

কাগজ প্রতিবেদক : জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত আইন পাসের দীর্ঘসূত্রতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিরা বলেছেন, কিছুসংখ্যক আমলার বাধার মুখে মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত আইন পাস হবে না– এটা মেনে নেওয়া যায় না।

অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, রাষ্ট্রের যেখানে মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব, সেখানে রাষ্ট্রই মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

গতকাল সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) আয়োজিত 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন' বিষয়ক এক গোলটেবিল আলোচনায় আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, এনজিও সংগঠক ও সমাজের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা এই অভিমত দেন।

গোলটেবিলে আলোচকরা অভিমত দেন, আমলাদের ধারণা মানবাধিকার কমিশন বাস্তবায়িত হলে তাদের অসুবিধা হবে। তাই তারা নানা অজুহাতে মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত আইন পাসের প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করছেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মানবাধিকার কমিশন গঠনের উদ্দেশে 'ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কাজে হাত দেয়। ১৯৯৭ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে আইনমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে মানবাধিকার কমিশনের আইনগত কাঠামোর খসড়া পেশ করেন। এর পরবর্তী দু বছর খসড়াটি বিভিন্নভাবে সংশোধিত হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের সুপারিশ যুক্ত করে খসড়াটি পুনর্লিখিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মতামতও খসড়াটিতে প্রতিফলিত হয়।

দীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনার প্রক্রিয়া পার হয়ে অবশেষে ১৯৯৯ সালের ৪ এপ্রিল আইন মন্ত্রণালয় আইনটির চূড়ান্ত খসড়া মন্ত্রিসভায় পাঠায়। এ সময় খসড়া বিলটি নিয়ে উত্থাপিত কিছু আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে আইনটি পুনঃপর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিসভা একটি উচ্চ পর্যায়ের সাবকমিটি গঠন করে। শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ এস কে সাদেক, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী খ ম জাহাঙ্গীর ও আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু ছিলেন এই সাব কমিটির সদস্য।

এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কয়েকদফা বৈঠকের পর নভেম্বরে পরিমার্জিত একটি খসড়া নিয়ে সাব-কমিটির সদস্যবৃন্দ ঐকমত্যে পৌঁছান। এ বছরের জানুয়ারিতে মানবাধিকার কমিশন বিলটি দ্বিতীয়বারের মতো মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে এজেন্ডা হিসেবে নির্ধারিত হয়।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি খসড়া বিলটি আবারো মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচিত হয়। কিন্তু বিলটির একটি ধারা সংবিধানপরিপন্থী বলে উল্লেখ করে তা আবারো সাব-কমিটিতে পাঠানো হয়।

গতকাল ড. কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আওয়ামী লীগ সাংসদ আখতারুজ্জামান, অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নারীনেত্রী খুশী কবির, এডভোকেট নিজামুল হক নাসিম, গণফোরাম নেতা জঁহিরুল ইসলাম ও সাংবাদিক নুরুল কবির।

স্বাগত বক্তব্যে এডভোকেট সাহাদীন মালিক প্রশ্ন করেন, মানবাধিকার কমিশন গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ৪ বছর আগে, তা আর কতোদিন চলবে? তিনি বলেন, আইনটির খসড়ায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। কিন্তু সে জন্য তো এমন জরুরি একটি আইন পাস বছরের পর বছর ঝুলে থাকতে পারে না।

ড. কামাল হোসেন বলেন, মানবাধিকার এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি আন্দোলন। আমাদের দেশেও মানবাধিকার কমিশন গঠন প্রশ্নে কারো মধ্যে দ্বি-মত নেই। সুতরাং কমিশন গঠনে অসুবিধা কোথায়?

তিনি বলেন, সরকারি ও বিরোধী দলের সম্মতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি গঠন করা হয়, নিরপেক্ষ মানবাধিকার কমিশনও গঠন করা সম্ভব। এ নিয়ে আমলারা যদি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়– দেখাক।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, কমিশন করার ব্যাপারে আমারও কোনো দ্বি-মত নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে ইংল্যান্ডের হিউম্যান রাইটস আর আমাদেরটা এক নয়। তিনি এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সবকিছু করার আশ্বাস দেন।

খুশী কবির বলেন, ভোট দেওয়ার বাইরেও দেশের মানুষের অনেক অধিকার রয়েছে। তাদের জানার অধিকার রয়েছে, তাদের দেওয়া অর্থ তাদের অধিকার হরণে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না।

সাংবাদিক নুরুল কবির বলেন, আমাদের দেশে অনে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে মানবাধিকার কমিশনের কোনো বিকল্প নেই।

দৈনিক মানবজমিন

এপ্রিল ৭, ২০০০

মানবাধিকার কমিশন গঠন অত্যন্ত জরুরি

ড. কামাল

স্টাফ রিপোর্টার : ড. কামাল হোসেন বলেছেন, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ছাড়া মানবাধিকার কমিশন গঠনে অন্য কারও দ্বিমত নেই। সুতাং সমাজ ও প্রশাসনিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করতে শিগ্‌গিরই একটি মানবাধিকার কমিশন গঠন করা উচিত। গতকাল সিরডাপ মিলনায়তনে লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট আয়োজিত 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' শীর্ষক এক মুক্ত আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন। তিনি আরও বলেছেন, ক্ষমতাসীনরা এক সময় নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ করার কথা বলতেন। অথচ ক্ষমতায় আসার প্রায় ৪ বছর পরও তারা একটি মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে পারেনি। যে সরকারের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ঐতিহ্য রয়েছে সে সরকারকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া উচিত। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের মানবাধিকারের ভিত্তি না থাকলে সমাজ পরিবর্তন হয় না। ড. কামাল হোসেন বলেন, এ ব্যাপারে কেউ বিতর্ক করতে গেলে সফল হবে না। সুতরাং দ্বিধাদ্বন্দ্ব দুর করে একটি মানবাধিকার কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, মানবাধিকারের সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্তিত্ব জড়িত। এটি গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। এর বিকল্প নেই। সুতরাং ঐকমত্যের ভিত্তিতে সময়োপযোগী একটি মানবাধিকার কমিশন গঠন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এরজন্য ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার। যে কোন আইন করার আগে ভুলত্রুটিগুলো পর্যালোচনা না করলে সমস্যা থেকে যাবে। যা পরবর্তীতে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অনুষ্ঠানে ড. শাহদীন মালিক মানবাধিকার কমিশনের ১টি খসড়া উপস্থাপন করেন। এর ওপর মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, আক্তারুজ্জামান এমপি, খুশি কবির, সিয়ার আবরার, জহিরুল ইসলাম, এড. নাসিম, সাংবাদিক নূরুল কবির প্রমুখ।

দৈনিক ইনকিলাব

এপ্রিল ৮, ২০০০

অবিলম্বে কার্যকর মানবাধিকার কমিশন গঠন করুন ॥ ডঃ কামাল

স্টাফ রিপোর্টার ॥ 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' শীর্ষক আলোচনাসভায় বক্তারা অবিলম্বে একটি কার্যকর মানবাধিকার কমিশন গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাসভার উদ্যোক্তা ছিল বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট।

গণফোরাম সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ ডঃ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আখতার উজ জামান, ডঃ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, গণফোরাম নেতা জহিরুল ইসলাম, এডাবের চেয়ারম্যান খুশী কবির, সাংবাদিক নূরুল কবির, অধ্যাপক সিআর আবরার প্রমুখ।

প্রথম আলো

এপ্রিল ৮, ২০০০

ব্লাস্ট আয়োজিত আলোচনা সভায় ড. কামাল

এই মুহূর্তেই মানবাধিকার কমিশন গঠন করা উচিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন নিয়ে এক আলোচনা সভায় ড. কামাল হোসেন বলেন, বিভিন্ন দল বা মতের সমর্থকদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই মুহূর্তেই এটা গঠন করা উচিত। গত বৃহস্পতিবার সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) আয়োজিত এক মুক্ত আলোচনায় ড. কামাল এ কথা বলেন। মানবাধিকার কমিশন গঠন সংক্রান্ত আইন পাস এবং কমিশন গঠন প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে এই আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ আলোচক ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন সরকারি দলের সাংসদ আখতার-উজ-জামান, ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, এডাব-এর চেয়ারপারসন খুশী কবির, অধ্যাপক সি আর আবরার প্রমুখ।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, জনগণের অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। তবে তাড়াহুড়ো করে একটি খারাপ কমিশন গঠনের থেকে সময় নিয়ে একটি আদর্শ কমিশন গঠনের চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। তিনি আরো বলেন, একটি সুষ্ঠ মানবাধিকার কমিশন গঠনের অঙ্গীকার পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মানবাধিকার কমিশন এখনো আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তার মতে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীরাই মানবাধিকার কমিশন গঠন নিয়ে দ্বিমত পোষণকারী।

ডাকসুর সাবেক ভিপি সংসদ সদস্য আখতার-উজ-জামান বলেন, মানবাধিকার কমিশন গঠনে যারা বিরোধিতা করেন তাদের এই আলোচনায় থাকা উচিত ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক সি আর আবরার মানবাধিকার রক্ষায় কেবল আইনের শাসন নয়, স্বাধীন একটি মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

এডাব চেয়ারপারসন খুশী কবির মানবাধিকার কমিশন নিয়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিবের আপত্তির তীব্র প্রতিবাদ জানান।

আলোচনার সমাপ্তি টেনে ড. কামাল হোসেন ক্ষমতার রাজনীতির চেয়ে জনগণের কল্যাণের রাজনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভোরের কাগজ
এপ্রিল ৯, ২০০০

মানবাধিকার কমিশন গঠনে রাষ্ট্রপতির একচ্ছত্র ক্ষমতা নিয়ে সরকার দ্বিধাদ্বন্দ্বে

অম্লান দেওয়ান : রাষ্ট্রপতির হাতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগদানের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া না দেওয়া নিয়ে সরকারের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে। এ কারণেই একটি নিরপেক্ষ ও কার্যকর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বিল পাসের প্রক্রিয়াও ঝুলে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক দায়িত্বশীল সূত্রে এ কথা জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, প্রস্তাবিত বিলে কমিশনের গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মানবাধিকার বিষয়ে জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন নাগরিকদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ করবেন।'

সূত্র বলেছে, কমিশন গঠনে প্রেসিডেন্টের একচ্ছত্র ক্ষমতা মেনে নিতে নারাজ মন্ত্রী ও সচিবসহ নীতিনির্ধারকদের বড়ো একটি অংশ। বিলটি আইনে পরিণত হলে সরকারের জন্য তা হিতে বিপরীত হতে পারে- এমন ধারণাও পোষণ করেন কেউ কেউ। মানবাধিকার কমিশন যাতে ভবিষ্যতে সরকারবিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান তারা।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকেও একটি ধারাকে সংবিধানপরিপন্থী মনে করায় বিলটি সংশোধনের জন্য পুনরায় সাবকমিটিতে পাঠানো হয়েছে এবং উক্ত সংশোধনের সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশগুলোও বিবেচনার অনুরোধ করা হয়েছে।

সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব সফিউর রহমান মানবাধিকার কমিশন গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বিল নিয়ে প্রথম আপত্তি তোলেন।

গত ২ জানুয়ারি এক প্রতিবেদনে তিনি প্রস্তাবিত বিলটির ● প্রথম পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

মানবাধিকার কমিশন

● প্রথম পাতার পর

বিরোধিতা করে বলেন, 'বিলটি পাস হলে প্রধানমন্ত্রীসহ সবার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পদে পদে মার্মলার সম্মুখীন হতে হবে। সৃষ্টি হবে কঠিন পরিস্থিতির। ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদে বিরত থাকার প্রবণতা দেখা দেবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে মামলা দায়ের করারও বিধান থাকলে এনজিওরা সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করবে। এই কমিশন হলে বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োগ দুঃসাধ্য হবে। কারাবন্দীরাও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ জানাবে।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর আইন বিষয়ক উপদেষ্টা শাহদীন মালিক বলেছেন, সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিবের আশঙ্কাগুলো পুরোপুরিই ভিত্তিহীন। কারণ খসড়া বিলের প্রস্তাবনা অনুসারে কাউকে শাস্তি দেওয়া বা ফাঁসি দেওয়ার ক্ষমতা কমিশনের থাকবে না।

কমিশন কেবল ঘটনার তদন্ত করে মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান বা বলবৎ কোনো আইনের আওতাধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করে তা বাস্তবায়নের সুপারিশ করবে মাত্র। সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকবে সরকারেরই হাতে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মানবাধিকার কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস ইন দিবসে আইনমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে মানবাধিকার কমিশনের আইনগত কাঠামোর খসড়া পেশ করেন। এর পরবর্তী দুই বছর খসড়াটি বিভিন্নভাবে সংশোধিত হয়।

দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার প্রক্রিয়া পার হয়ে অবশেষে ১৯৯৯ সালের ৪ এপ্রিল আইন মন্ত্রণালয় আইনটির চূড়ান্ত খসড়া মন্ত্রিসভায় পাঠায়। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কয়েক দফা বৈঠকের পর নভেম্বরে পরিমার্জিত একটি খসড়া নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সাবকমিটির সদস্যরা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি খসড়া বিলটি আবারো মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয়। কিন্তু বিলটির একটি ধারা সংবিধানপরিপন্থী উল্লেখ করে তা আবারো সাবকমিটিতে পাঠানো হয়।

প্রথম আলো
এপ্রিল ১১, ২০০০

যে কারণে মানবাধিকার কমিশন 'রিমান্ডে'

আলতাফ পারভেজ ও মোঃ রফিকুজ্জামান

মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর অন্যতম। মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে একটি কার্যকর ব্যবস্থার সন্ধানে আধুনিক রাষ্ট্রগুলো সচেষ্টও বটে। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাই মানবাধিকার প্রতিরোধে যথেষ্ট নয়। এ সত্য উপলব্ধি থেকেই নতুন ব্যবস্থার সন্ধান। বিগত বছরগুলোতে অনেক রাষ্ট্র তাদের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা থেকে জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের দেশেও এ জাতীয় একটি কমিশন গঠনের পক্ষে ঐকমত্য গড়ে উঠেছে এবং তা বিশেষ বেগবান হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের জোরালো অঙ্গীকারের মাধ্যমে।

কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিশ্রুত সেই মানবাধিকার কমিশন গঠনের বিষয়টি এখন হঠাৎ করে অনিশ্চয়তায় পড়েছে। ক্যাবিনেট সাব-কমিটির অনুমোদন সত্ত্বেও ক্ষমতাধর একজন সচিবের আপত্তিতে প্রধানমন্ত্রী বিলটিতে নারাজ হয়ে আছেন। বলা যায়, মানবাধিকার কমিশন বিল এখন 'রিমান্ডে' আছে।

মানবাধিকার বিল তৈরির পটভূমি

মানবাধিকার কমিশন নিয়ে কাজ শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। এটা ছিল ইউএনডিপির অর্থায়নে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প। তৎপরতা শুরু হয় ভারত, নেপালসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানবাধিকার কমিশনের কাঠামো, দায়িত্ব, লক্ষ্য ইত্যাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে। জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার কমিশন গঠনের জন্য যে মানদণ্ড (প্যারিস প্রিন্সিপাল নামে পরিচিত) ঠিক করেছে তার আলোকেই কার্যক্রম চলে।

বর্তমান আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু প্রথম থেকে বিশেষ আন্তরিক ও সক্রিয় ছিলেন। ফলে এক বছরেই কাজ শেষ হয়ে আসে। ১৯৯৭-এর ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে সিভিল সমাজের নেতাদের এক সভায় জড়ো করে আনুষ্ঠানিকভাবে মানবাধিকার কমিশনের আইনগত কাঠামোর খসড়া পেশ করেন আইনমন্ত্রী।

সে থেকে পরবর্তী দুবছর চলে এর সংশোধনের পালা। দেশের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মীদের সুপারিশ যুক্ত করে খসড়াটি নমনীয় করে পুনর্লিখিত হয়। পর্যালোচনা প্রক্রিয়াটি ছিল দীর্ঘ এবং ব্যাপক। বিদেশী অনেক বিশেষজ্ঞ, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও খসড়াটি তৈরির প্রক্রিয়ায় মতামত দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীও জনসমক্ষে আসন্ন এই কমিশন গঠনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন কয়েক দফা।

শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত খসড়াটি ক্যাবিনেটে যায় গত বছরের ৪ এপ্রিলে। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে, মন্ত্রিসভায় প্রথম আপত্তি ওঠে শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ এস কে সাদেকের তরফ থেকে। আপত্তির কারণে আইনটি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিসভা একটি সাব-কমিটি গঠন করে। এ মন্ত্রিসভা সাব-কমিটির সদস্য ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ এস কে সাদেক, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, টিএন্ডটি মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী খ ম জাহাঙ্গীর এবং আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু।

আওয়ামী লীগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এ কমিটি এপ্রিল থেকে পরবর্তী মাসগুলোতে কয়েক দফা বৈঠক করেন। নভেম্বর নাগাদ পরিমার্জিত একটি খসড়া নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেন তারা। এ বছরের ৩ জানুয়ারি মানবাধিকার কমিশন বিল দ্বিতীয়বারের মতো মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে এজেন্ডা হিসেবে নির্ধারিত হয়।

এরই মাঝে কয়েকজন সচিব সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, সচিবদের এ সক্রিয়তায় নেতৃত্ব দেন সদ্য অবসরে যাওয়া স্বরাষ্ট্র সচিব শফিউর রহমান। তার প্রতি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর 'বিশেষ আস্থা'কে কাজে লাগিয়ে প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি তিন পৃষ্ঠার লিখিত আপত্তি পেশ করেন। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এ আপত্তি পেশ হয় ৩ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকের ঠিক আগের দিন।

বিগত দিনগুলোতে শফিউর রহমানের অনেক 'সুপারিশ' প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত হওয়ার ধারাবাহিকতা থেকে মানবাধিকার কমিশন বিলও আটকে যায় সেদিন। ক্যাবিনেট বৈঠকে বিলটি আর ওঠেনি। ক্যাবিনেট থেকে বিলটি পার্লামেন্টে যেত, কিন্তু পুরো ব্যাপারটি এখন ফাইলবন্দি। অথচ নেতিবাচক এই সিদ্ধান্তের দুদিন আগে সংসদে রাষ্ট্রপতির 'মিলেনিয়াম ভাষণে' বলা হয়েছিল 'মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ কল্পে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের খসড়া সরকার নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে।' সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা তুমুল হাততালি দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতির এ বক্তব্যে।

কী ধরনের প্রস্তাবিত কমিশন

মূলত দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে 'মানবাধিকার কমিশন' গঠনের প্রস্তাব। আগেই বলেছি, পৃথিবীর অনেক দেশে এ কমিশন আছে। 'মানবাধিকার' বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক মূলনীতিও বটে।

বিল আকারে সংসদে অনুমোদিত হলে 'মানবাধিকার কমিশন' সার্বক্ষণিক চারজন সদস্য ও একজন চেয়ারপারসন নিয়ে স্থাপিত হতো। প্রধানমন্ত্রী, সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা, প্রধান বিচারপতি এবং আইনমন্ত্রীর সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতিকর্তৃক তিন বছর মেয়াদে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ দেওয়ার কথা।

এ কমিশন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানবাধিকার বিষয়ে দেশের নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও সংসদকে জাতীয়ভাবে পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতো। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্ত করারও অধিকার থাকত তার। সে অধিকার হতো দেওয়ানী আদালতের মতো। এরকম সর্বমোট ১৪টি কাজ ছিল প্রস্তাবিত কমিশনের।

প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে অথচ মানবাধিকার কমিশন গঠন এখনো অনিশ্চিত

স্বরাষ্ট্র সচিবের আপত্তি

গত ২ জানুয়ারি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব মানবাধিকার কমিশন বিল সম্পর্কে যেসব আপত্তি পেশ করেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. বিলে মানবাধিকার লঙ্ঘনকে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে—এর ফলে প্রধানমন্ত্রীসহ সবার বিরুদ্ধে মামলা হবে।

২. মানবাধিকার কমিশন দ্বারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের পদে পদে মামলার সম্মুখীন হতে হবে। তাদের জন্য এক 'কঠিন পরিস্থিতি'র সৃষ্টি হবে। ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদে বিরত থাকার প্রবণতা দেখাবে তারা।

৩. মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনো ব্যক্তির মামলা দায়েরের বিধান থাকলে এনজিওরা সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করবে। আসলে এনজিওদের নিয়ন্ত্রণের বিধান প্রয়োজন।

৪. আদালতে বিচারাধীন মানবাধিকার মামলায় কমিশন অংশ নিলে সরকারি কর্মকর্তারা বিব্রতবোধ করবেন। কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ নেই।

৫. এ কমিশন হলে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও হরতালের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে না।

৬. এ কমিশন হলে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ব্যবহার দুঃসাধ্য হবে।

৭. এ কমিশন হলে কারাবন্দিরাও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ জানাবে।

শফিউর রহমান সর্বশেষ বলেছেন, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য যেন কেবল 'সতর্ক করে দেওয়া হয় বা বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়'। অর্থাৎ তাদের প্রচলিত অর্থে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

উল্লেখ্য, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে শফিউর রহমান সাহেব ছিলেন ডেপুটি কমিশনার মর্যাদার রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা। সে সময় 'বাকশাল'-এর আওতায় তাকে গভর্নর করার উদ্যোগ ছিল। '৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর শফিউর রহমানের জন্য একটা কঠিন সময় যায়। কিছু দিন অন্যায়ভাবে জেলেও থাকতে হয় তাকে। ১৯৯৬-এ 'জনতার মঞ্চ' সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে কথিত আছে। জীবনবৃত্তান্তের উল্লিখিত বিষয়গুলো বর্তমান সরকারের শীর্ষ মহলে তাকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য করে তোলে। যে কারণে শফিউর রহমান মানবাধিকার কমিশন বিল নিয়ে যেসব আপত্তি তুলেছেন, তার অনেকগুলো যে আদৌ সত্য নয়, প্রধানমন্ত্রী তাও খতিয়ে দেখেননি বলেই মনে হয়েছে। যেমন, প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশনের কাউকে সাজা দেওয়ার বা মামলা দায়েরের কোনো ক্ষমতা নেই। এর ভূমিকা একান্তই সুপারিশমূলক। সেই সুপারিশ সরকার তথা রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ মানতেও বাধ্য নয়। সুতরাং শফিউর রহমানের প্রথম ও দ্বিতীয় আশঙ্কা পুরোপুরি অসত্য। তিনি আপিলের সুযোগ দাবি করেছেন। এ দাবিও অপ্রাসঙ্গিক। সুপারিশের বিরুদ্ধে কি আপিল হয়? যেকোনো সুপারিশ গ্রহণেরই তো বাধ্যবাধকতা নেই।

তৃতীয়ত, 'রিমান্ড' প্রসঙ্গে বলেছেন সচিব মহোদয়। বাস্তবে 'রিমান্ড' মঞ্জুর হয় ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড অনুযায়ী। মানবাধিকার কমিশনের এ ক্ষেত্রে কিছু করার নেই। এভাবে শফিউর রহমানের পুরো আপত্তির ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে বলা যায়। সম্ভবত তিনি প্রস্তাবিত মানবাধিকার কমিশন বিল ভালো করে পড়েননি বা প্রধানমন্ত্রীকে পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, ইউএনডিপি, ড্যানিডা, ইত্যাদি সংস্থা সরকারকে আগাম বলে রেখেছে—মানবাধিকার কমিশন হলে তার জন্য আর্থিক সহায়তা দিতে তারা প্রস্তুত। জানা গেছে, এ প্রস্তাব প্রায় ৫০ কোটি টাকার। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, বিদেশীরা এখানকার মানবাধিকার উন্নয়নে টাকা দিতে চায়, কিন্তু পথ রুদ্ধ করে থাকেন আমাদের 'জনসেবকরা'।

আলতাফ পারভেজ : সাংবাদিক, গবেষক,
মোঃ রফিকুজ্জামান : মানবাধিকার সংগঠক।